আমাদের সময়ের এক অন্যরকম চারণিক

চিন্ময় গুহ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে দেখে প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায়নি যে এই মরা গাঙে ঘনায়মান আঁধারে এমন এক দীপ্তিময় জীবনপিপাসু এত প্রবল ভাবে বেঁচে আছেন। চেহারায়, শব্দচয়নের সাবলীল মধুরতায়, জ্ঞানে, সৌজন্যে পূর্ণ এক মানুষ। তাঁর সারা গায়ে নক্ষত্রের গুঁড়ো।

তিনি নিরন্তর এক সর্বার্থে সৃজনশীল জীবন যাপন করে চলেছেন, এক বিরল একাগ্রতায় নতুন নতুন অভিযানে প্রবাহিত হচ্ছেন সীমা থেকে অসীমে। এই গিরিখাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা কে অস্বীকার করবে যে কাজটি সহজ নয়! যেন তাঁর সমস্ত অক্ষরে ও উপস্থাপনায় আঁকা হয়ে আছে বোরহেসের 'নিরন্তর' কবিতার সেই জাদু-পংক্তি: 'Sólo una causa no hay. Es el olvido'. (One thing alone does not exist– oblivion.)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এক জীবনে যা করেছেন তা করতে বোধহয় দশটি জীবন লাগে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে, তুলির আঁচড় দেখতে দেখতে, দূরদর্শনে তাঁর উদ্ভাসিত ভ্রমণকথা শুনতে শুনতে আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি এত অধুনাবাঙালিদুর্লভ প্রাণশক্তি তিনি পেলেন কোথা থেকে? এত মায়া আর জাদু? এত বিস্ময়? চারপাশে দিশাহারা উচ্চাভিলাষী প্রলাপকীর্তনের মধ্যে যেন এক সন্ন্যাসী পর্যটক। দুর্ভাগা আমরা, আমাদের চোখে তাম্রনীবি, আমরা তো পারিনি।

তিনি প্রথম যুগ থেকে সাহিত্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর তারুণ্যের উদ্যম ও স্বপ্ন দিয়ে। শঙ্খ ঘোষের ভাষায়:

> একজন সদ্যতরুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া তখনও সাঙ্গ হয়নি তাঁর, একটি পত্রিকার পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন একদিন, ১৯৬৬ সালে। এঁর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কেননা ওই বয়সটাই নানারকম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠবার সময়। *বিস্ময় ছিল তাঁর ভাবনার নতুনত্বে।* সেই তরুণের— অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর— মনে হচ্ছিল, একটি মাসিক পত্রিকার দরকার যেখানে কেবল কবিতা পড়বার পদ্ধতি নিয়েই কথা হবে। এক-একটি কবিতা নিয়ে কথা বলবেন এক-একজন। কীভাবে তিনি পড়েছেন সেই কবিতা, বলবেন শুধু সেইটুকুই, আর কিছু নয়।... অমরেন্দ্রর প্রস্তাবে তাই মেতে উঠলাম আমরা।... আর, আশ্চর্য, প্রথম

সংখ্যা থেকেই তার কপালে আদরও জুটল অনেক। (সামান্য-অসামান্য')

'ক্লাস-পড়ার দায়' ছেড়ে দিয়ে সকাল থেকে, কখনও বা সারা রাত, বাড়িছাড়া অমরেন্দ্র তৈরি করলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'কবিতা' আর 'পরিচয়' নাম মিলিয়ে বৈপ্লবিক এক পত্রিকা 'কবিতা-পরিচয়'। কবিতা-পাঠ নিয়ে এই স্বতন্ত্র পত্রিকা ছয়ের দশকে স্বল্প সময়ে একটি স্বর্ণময় অধ্যায় রেখে গেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা নিয়ে লিখেছেন শঙ্খদা স্বয়ং, সে-লেখার প্রতিবাদ-প্রবন্ধ লিখেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের দ্বৈরথ হয়েছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' নিয়ে শঙ্খ ঘোষের রচনাটি তো পাঠ-দর্শনের ক্লাসিক হয়ে আছে। লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ-সহ আরও অনেকে। এমনকী অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বুদ্ধদেব বসু।

১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি বুদ্ধদেব লিখেছিলেন অমিয় দেবকে: 'তু সা বি'র এক বোহেমিয়ান ছাত্র 'কবিতা-পরিচয়' নামে একটা পত্রিকা বের করছে, দুটো বিখ্যাত পত্রিকার নামের এই সমন্বয়ের অর্থ হল Explication. সম্পাদকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমিও একটা এক্সপ্লিকাসিয়ঁ লিখলাম, সুধীন্দ্রনাথের ' নৌকাডুবি' ('দশমী'র দ্বিতীয় কবিতা) বিষয়ে।

এই কাগজ বন্ধ করা হল ঠিক সময়ে। একটুও আগে বা পরে নয়। সেটাও একটা শিল্প।

'কর্মক্ষেত্র' সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘকাল, যা মহাশ্বেতা দেবীর মতে এক বিশল্যকরণী। পঁচিশ বছর এই রকম সামাজিক এক কর্তব্য পালন করেছেন একজন জাত সাহিত্যিক ভাবলে বিস্মিত হই। তারপর চলে এলেন মনের আরেক প্রান্তে: 'ভ্রমণ' পত্রিকা ও দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের ভিডিও নিয়ে। হয়তো তা তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির একটি। কথনে আর রচনায় এ এক জাদু-সংযোজন যা খুলে দিতে চাইল হাজার কপাট। আর সম্পাদনা করেছেন মননশীল পত্রিকা 'কালের কষ্টিপাথর'। যেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এক রংদানির সামনে দাঁড়িয়ে। যেন ঠিক ঠিক জানেন কী কী রসদ চাই আজকের এই কলঙ্কশীলিত অন্ধতার শুদ্ধির জন্য।

'শাদা ঘোড়া' আর 'হীরু ডাকাত' তো শিশুসাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে গেছে। আমি পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাবি, এত কাচস্বচ্ছ লিখন বেশি দেখেছি কিনা। যেন ঝিরঝির করে সুরেলা বৃষ্টি পড়ছে স্নায়ুর ওপর, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। কখনও ছন্দ দোলা দেয়। অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব সাবলীলতার কথা মনে পড়বে, এ ভাষা তার নিজস্বতায় সমুজ্জ্বল। আরেক অতুলনীয়া শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার 'হীরু ডাকাত' নিয়ে আলোচনার শুরুতেই লিখেছেন, 'শাদা ঘোড়া' পড়ে ভেবেছিলাম কি ভালো কি ভালো! এ যে আরও ভালো; মনকে নাড়া দেয়। রূপকথার রূপ ধরে বাংলার ইতিহাস কথা কয়।' লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়... আর কাকে লাগে মূল্যায়নের জন্য? রস আর আবিষ্কার একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, শিশুমনে এমন সহজ করে রূপকথার ছাপ রাখার কত যে প্রয়োজন আজ এই অচিকিৎস্য যন্ত্র-নির্ভরতার যুগে! যখন তিনি লিখলেন 'শাদা ঘোড়া' (১৯৭৯) আর 'হীরু ডাকাত' (১৯৮৬), তখন কম্পিউটার-যুগ শুরু হতে চলেছে, যা গ্রাস করে

নেবে শিশুমন। সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এগুলি যেন ম্যাজিক-লণ্ঠন।

হীরু ডাকাতের সাদা চুল আর সাদা দাড়ি।
গ্রামে গ্রামে হীরু ঘোরেন বাড়ি বাড়ি।
কার কী অভাব, কার কী দুঃখ,
কার শাড়ি নেই, বা চুল রুক্ষ,
কিংবা কে আজ দু-দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে
চাল নেই তাই গাছের পাতা সিদ্ধ খাচ্ছে—
সবই দেখেন, সবই শোনেন, সব মানুষের দুঃখ গোনেন,
তারপর যেই বাঁশি বাজান আপন মনে—

ঠিক মনে হয় কাঁদছে হীরু, কাঁদছে প্রবল।
ঠিক মনে হয় বাঁশিটি তার চোখেরই জল।
ঠিক মনে হয় হাওয়া কাঁদছে, কাঁদছে মাটি।
সন্ধে হলেই হীরু দেবেন ঢাকে কাঠি।

আমাদের এই গ্রামের নামটি চাঁদের হাট!
এই গ্রামেরই বেত থেকে হয় ছাতার বাঁট।
এখানকার এই হীরু ডাকাত বিখ্যাত,
রাতে ডাকাত, দিনে করেন ভিক্ষা তো!

ভোরের বেলা ফেরেন যখন জবা বলে
লুটের অন্ন রেখে আসেন দুঃখীলোকের হিম উঠোনে।

হীরু কী খান?
ভিড়া যা পান।

এও লক্ষ্য করবার, 'শাদা ঘোড়া' যখন লেখা হচ্ছে, তখন শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগ নয়, বরং এক অন্ধকার সময়। সেই অন্ধকারে 'শাদা ঘোড়া' এক নতুন আলোর প্রদীপ।

'শাদা ঘোড়া' ১৯৭৪ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় সোমবারের 'আনন্দমেলা'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, সত্যজিৎ রায় যদি শেষ পর্যন্ত 'শাদা ঘোড়া' উপন্যাস থেকে ছবি করতেন, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর নির্মাতার হাতে কী জাদুচিত্র তৈরি হতো কে জানে! সেই মণিকাঞ্চনযোগ আমাদের দেখা হল না।

'আমাজনের জঙ্গলে' পড়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে শিশুদের এক মস্ত প্রয়োজন মেটানো হল। লিখেছিলেন, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী 'এই সময় ও যুগের এক অন্যরকম চারণিক'। গল্প বলার এক স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা তাঁর, আমরা যারা গল্প শুনতে শুনতে বড় হয়েছি তারা আবার এইসব আশ্চর্য বই পড়তে পড়তে এক অলীক স্বপ্নের দ্বীপে ফিরে যাই। জঙ্গলে ধ্বংসলীলার কথাও আছে, আজ মহামারীতে

যার অভিঘাত আমরা দেখছি। যারা পড়েনি তারা জানল না কী হারাল!

আসলে দেশটা আর পৃথিবীটাকে তিনি দেখেছেন, ভ্রামণিকের মতো করে নয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, যা তাঁর কবিতায়, গল্পে, দুটি উপন্যাসে দৃশ্যমান। এ যেন এক প্রতিধ্বনিময় দীর্ঘ পরিক্রমা। কবিতাপাগল মানুষটি কবিতা ছাড়েননি, সেটা শুধু তাঁর কবিতায় নয়, উপন্যাস দুটিতেও প্রবহমান:

'বালিসোনার শিমুলগাছ লাল ফুলে ভরে গেছে, সজনে ফুল শেষ হয়ে ডালে ডালে ডাটার সূচনা হয়ে গেল, হঠাৎ হঠাৎ মন-উদাসী হাওয়া দিচ্ছে, সেই পূর্ণ বসন্তে একদিন তিকান হারিয়ে গেল।'

অথবা

'মাঠ জনশূন্য হবার পর চারদিকে চটি, গায়ের চাদর, চশমা, ঘড়ি, ভাঙা কাচের চুড়ি, ধুলো-কাদামাখা চুরনি, ছাপা শাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজ, কামিজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা গেল। নিরঞ্জনের বুকে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তার শালী তখনও আর্তস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে— তাঁতে নতুন নকশা চড়িয়ে গ্রামের বাইরে যেতে নেই জানতেন না? তবে কেন এলেন? কেন এলেন? আমায় নিয়ে কেন এলেন?'

কিংবা

'...আমি থাকি সাগরের বুকে ছোট্ট একটা দ্বীপে। দিনের শেষে নৌকোয় চলে যাই। গাছের ওপর কাঠের বাড়ি, আমিই বানিয়েছি।... জোয়ারে দ্বীপে জল উঠে যায় বলে ঘরে যাবার বাঁশের সিঁড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখি। জোছনায় দ্বীপটা যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখায় তুমি ভাবতে পারবে না।'

(বিষাদগাথা)

'জিপসি রাত'-এও:

'জ্যোৎস্নায় বোঝা যায়নি, ভোরের আলোয় দেখা গেল পাটির ওপর ঘুমন্ত ইলিনার শ্বেতবর্ণ দেহ ঘিরে ভবিষ্যতের-প্রজাপতি শুঁয়োপোকারা তাদের অভ্যাসমতো চরে বেড়াচ্ছে।'

অথবা

'চিতাভস্মের কাছেই টানা তিনদিন তিনরাত বসে থাকতে থাকতে সাহাবুদ্দিনের অসংখ্যা বার পীড়াপীড়ি ও মুমতাজের অবিরাম কান্না সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নীরব থাকার পর চতুর্থ দিন অস্তসূর্যের লালপিণ্ড থেকে অন্ধপ্রায় চোখ নামিয়ে এনে সুধীন প্রথম কথা বলল— 'সঙ্গে একটা কানা বুড়ি ছিল না?'

কিংবা

'চৈত্রের শেষে রোজই যখন ছাদের পুবদিক পুরোটাই ঝাঁক ঝাঁক বেলফুলে ভরে থাকে, তখন মুমতাজ ওরফে যমুনাকণা সুধীনের লেখাপড়ার টেবিলে সোনালি মিনে করা নীল ফুলদানিতে বেলফুল সাজিয়ে রাখতে রাখতে সুধীনের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে। তার কথার স্রোত রোজকার মতো এই একটা কথাতেই এসে থামে যে, 'সুদিন' কবে ছাদে পুকুর বানিয়ে অনেক অনেক নীল শালুক ফুল ফোটাবে।'

প্রথাগত চলন থেকে সরে এসে 'বিষাদগাথা'র বিষণ্ণগীতিধর্মী আখ্যান পদ্ধতিতে

জাদুবাস্তব এমন ভাবে এসেছে যে চমকে উঠতে হয়। এই বহুস্তর ও বহুমাত্রিক পরিবার-কাহিনি কি সমকালীন সাহিত্যের এক ক্লাসিক নয়? এটি যেন মার্কেসের 'একশ বছরের নির্জনতা'র ধরনের এক তীব্র গতিতে চলমান বহুমাত্রিক দুঃসাহসী চালচিত্র। সবকিছুই যেন গিয়ে মেশে কবিতার স্বপ্নে, সেই ১৯৬২ সালে একুশ বছর বয়সে একদিন 'বিক্ষত অন্বেষণ' দিয়ে যা শুরু হয়েছিল।

কাল স্বপ্নের মধ্যে আমার খুব অহংকার হয়েছিল
এমনিতে সাইকেলে হেডলাইট ছিল না বলে পুলিশ আমাকে সারারাত
লকআপে রেখেছে কতদিন
নিজের বাড়ি ছিল না বলে আমি কখনো নারীর দিকে হাত বাড়াইনি
পায়ে জুতো ছিল না বলে তাবৎ কীট-পতঙ্গ উল্লাসে উৎপাত করেছে
আমার দু-পায়ে
আমি কখনো বন্যার্ত-তহবিলে এক টাকা চাঁদা দিতে পারিনি
ভিড়ের মধ্যে গলা উঁচিয়ে বলতে পারিনি, আমাদের এই সময়
আমার পছন্দ নয়।

অথচ কাল স্বপ্নের মধ্যে ময়দানে ঈদের নামাজের মতো হাজার হাজার
কবিতা আমার সামনে নতজানু
আমি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করিনি
আমি তাদের বলেছি
দ্যাখো, এসব আমার ভালো লাগছে না।
আমি তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম,
এর মধ্যে তোমাদের যুগকে মমতাময়ী নারীর মতো করে দিতে হবে।
নাহলে আমি সব ভস্ম করে দেবো!

১৯৭৫-এ লিখিত এ কবিতার সাত বছর আগের একটি কবিতাও এখানে মনে আসে:

কী নাম?

ঘর বাড়ি মাঠ আকাশ পাতাল
বিচারসভার রুক্ষ চাতাল
প্রতি নিয়ত প্রশ্ন করে— কী নাম?
চারদিকে কূট লৌহজটিল
বন্ধ জানলা, দুয়ারে খিল,
সব অপমান মাথায় তুলে নিলাম।
একলা নিরুত্তরে থাকি,
চাদরে মুখ শরীর ঢাকি,
সময় হলে বলবো আমার কী নাম।

সম্প্রতি অনূদিত তাঁর মোঙ্গোলীয় কবিতার নমুনা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল এ

যেন সীমারেখা মুছে ফেলার তৃষ্ণা। তাঁর আঁকা ভিন্নধর্মী অদ্ভুতরসের ছবিও তো তাঁর অন্বেষণের অঙ্গ।

এই কবি ও কথাকার প্রায় সারা পৃথিবী চষে ফেলেছেন হাতে একটি ছোট ক্যামেরা নিয়ে। তাঁর ভিডিও-চিত্রের উপস্থাপনা আমার প্রিয়। অজানা দেশ দেখার আনন্দ— যেমন ধরা যাক, আন্টার্কটিকা, আলাস্কা, সুমেরুবৃত্ত, মোঙ্গোলিয়া, চিন বা জর্ডন, ইন্দোনেশিয়া কি ইজ্রায়েল বা মিশর কি মায়ানমার— এমন ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন তিনি, যা বিদেশি ভ্রমণ-ভিডিওগুলিতেও কম দেখেছি। এগুলি বারবার দেখতে সাধ হয়। সহজ গতিতে ক্যামেরার দৃষ্টিপাত আর স্বল্প কথায় মন্দ্রিত অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ছুঁয়ে যায় মনের চোখ।

এখন অনেক রাত। বাইরে তারাভরা আকাশ। জ্যোৎস্নাজন্ম পার হয়ে আমি পড়ছি তাঁরই লেখা রোয়ান্ডার জঙ্গলের গরিলার কথা।